OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 45
Website: https://tirj.org.in, Page No. 416 - 426
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 416 - 426
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলা উপন্যাসে নদী-ভাঙনের আর্থ-সামাজিক প্রভাব

ড. শুভেন্দু মণ্ডল
অতিথি অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ, বাজকুল মিলনী মহাবিদ্যালয়
Email ID : shubhendumondal90@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
River bank erosion, River Migration, Socio-economic impact, River management, River traditions, 'Char' lifestyle.

Abstract
The relationship of rivers with humans is eternal. Since the era of ancientcivilization, people have been worshipping riversas gods. They settledalong its banks and earned a living for themselves. Sometimes the river appeared as a blessing, and at times it flooded both the banks and destroyed villages. An amazing combinationof life running with the flow of the river. If we look at the history of Bengali novels, just as we find river-centric novels, we also come across the socio-economicalimpact of river erosion as the context of many novels. Although the interrelationship between rivers and people is observed in the novels of Bankim Chandra, Rabindranath or Kazi Abdul Odud, the story oferosion and braid bar-centric people have come up in the novels of Amarendra Ghosh, Narayan Gangopadhyay, Amiyabhusen Majumdar, Abdul Jabbar, SadhanChattopadhyay and Abul Bashar.

Discussion

নদীর সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের আবেদন চিরকালীন। প্রাচীন সভ্যতার যুগ থেকে মানুষ নদীকে দেবতার জ্ঞানে পুজো করেছে এবং তারই তীরে বসতি স্থাপন করে জীবিকা অর্জন করেছে। নদী কখনো মানুষের কাছে আশীর্বাদ স্বরূপ হয়ে দেখা দিয়েছে। আবার কখনো দু'কূল ভাসিয়ে গ্রামের পর গ্রাম মানুষকে উজার করে দিয়েছে। বহতা নদীর সঙ্গে চলমান জীবনের এক আশ্চর্য মেলবন্ধন লক্ষ করা যায়। বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসের দিকে লক্ষ করলে যেমন নদীকেন্দ্রিক উপন্যাসের সন্ধান মেলে, তেমনি অনেক উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে দেখা যায় নদী-ভাঙনের আর্থ-সামাজিক রূপটি। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ কিংবা কাজী আব্দুল ওদুদের উপন্যাসে নদী ও মানুষের আন্তঃসম্পর্কের চিত্র পরিলক্ষিত হলেও নদী-ভাঙন ও চরকেন্দ্রিক মানুষের কথা উঠে এসেছে অমরেন্দ্র ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, অমিয়ভূষণ মজুমদার, আব্দুল জব্বার, সাধন চট্টোপাধ্যায় এবং আবুল বাশারের উপন্যাসে। এই সকল ঔপন্যাসিকের কলমে স্বাধীনতা-পরবর্তী নদী-ভাঙন এলাকার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ-পরিস্থিতির কথাকতা আলোচনার পূর্বে নদী-ভাঙন সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত পরিচয় নেওয়া যাক –

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 45
Website: https://tirj.org.in, Page No. 416 - 426
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নদী-ভাঙন : বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে নদী-ভাঙন একটি অন্যতম প্রাকৃতিক বিপর্যয় হিসেবে পরিচিত। নদী-ভাঙন বলতে নদীর জল-প্রবাহের ফলে নদীর তীর বা পাড়ের ভাঙনকে বোঝায়। এই ভাঙনে নদীর তীরবর্তী বাড়িঘর, কৃষিভূমি, বাজার-হাট, রাস্তা-ঘাট, অফিস-আদালত, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, বনভূমি প্রভৃতিকে নদীগর্ভে বিলীন করে দেয়। জলচক্রের প্রভাবে পর্বতের গায়ে বরফ জমে সেই বরফ গলা জল পর্বতের গা থেকে নেমে আসে। সেই নামা অংশ জল থেকেই নদীর সৃষ্টি। নদীর এই জল সমুদ্রের দিকে ধাবিত হয়। সাধারণত সমুদ্রের কাছাকাছি অর্থাৎ নিম্নগতি অংশে নদীর জল তীব্র গতিতে ছুটে চলে। এছাড়াও ভরা বর্ষার মরশুমে উজানে তীব্র বৃষ্টিপাত হলে নদীর জল বেড়ে যায়। তখন নদীর স্রোতও যায় বেড়ে। নদীর এই তীব্র স্রোত ভাটার দিকে চলার পাশাপাশি নদীর পাড়ে আঘাত করতে থাকে। জলের এই ক্রমাগত তীব্র আঘাতে নদী তীরবর্তী ভূভাগ ক্ষয় হতে থাকে। এক সময় মাটি ক্ষয় হতে হতে যখন উপরের মাটির ভার সহ্য করতে পারে না। তখন উপরের অক্ষয় মাটিসহ নদী পাড়ের বিশাল অংশ নদীর গর্ভের মধ্যে ভেঙে পড়ে। এসব কারণেই ভাঙন এলাকায় নদীর জল হয় গলিত মাটিপূর্ণ, ঘোলা। সাধারণত নদী, তার জলের গতিপথে কোনো বাধা পেলে তাতে তীব্র আঘাত করে। নদী গতিপথ বদলাবার সময় যেদিকে গতি বদলায়, সেদিকের পাড় বরাবর তীব্রগতিতে আঘাত করতে থাকে। সাধারণ ক্ষেত্রে উপকূলবর্তী এলাকা পলিগঠিত হওয়ায়, নরম পলিমাটির স্তর সেই আঘাত সহ্য করতে না পেরে ভেঙে পড়ে। এইভাবে নদী একদিকের পাড় ভাঙতে থাকলেও অপরদিক থেকে গতি বদলে নেয় বলে অপর দিকে গলিত পলিমাটি নিয়ে জমা করতে থাকে। তাই নদী-ভাঙনের মাধ্যমে নদীর এক পাড় ভাঙে আর এক পাড় গড়ে।[১] আবার নদী কোথাও চরের সৃষ্টি করতে থাকে। তবে এই ভাঙন (erosion) সম্পর্কে আভিধানিক কয়েকটি বক্তব্য তুলে ধরা যেতে পারে। 'The American Haritage Dictionary'-তে 'Erosion' সম্পর্কে বলা হয়েছে —

> "The gradual wearing away of land surface materials, especially rocks, sediments, and soils by the action of water, wind, or a glacier. Usually erosion also involves the transfer of eroded material from one place to another, as from the top of a mountain to an adjacent valley, or from the upstream portion of a river to the downstream portion."[২]

অর্থাৎ, জল, বায়ু বা হিমবাহের কর্ম দ্বারা ক্রমবর্ধমান ভূমিপৃষ্ঠ উপাদান, বিশেষ করে পাথর, পলল এবং মৃত্তিকাকে দূরে পরিবেশন করে। সাধারণত ভাঙনের ফলে ভাঙন উপকরণটি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হয়, যেমনটি একটি পর্বতের উপর থেকে একটি সন্নিহিত উপত্যকায় বা নদী থেকে প্রবাহিত অংশ থেকে প্রান্তবর্তী অংশে অবস্থিতি লাভ করে।

আবার, 'Illustrated Dictionary of Architecture'-তে 'Erosion' সম্পর্কে বলা হয়েছে —

> "The wearing away of the land surface by rain or irrigation water, wind, ice, or other natural of anthopogenic agents that abrade, detech, and remove geologic parent material or soil from one point on the Earth's surface and deposit it elsewhere, including such processes as gravitational crcep and so-called tillage erosion."[৩]

সাধারণত ভাবে ভারী বর্ষার মৌসুমে নদীতে অতিরিক্ত জল প্রবাহের ফলে সৃষ্টি হয় নদী-ভাঙন। অনেকে মনে করেন, জলের আঘাতে নদীর তীরবর্তী কৃষিজমি বা ঘরবাড়ি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়াকে নদী-ভাঙন বলা যায়।[৪] আবার এ সম্পর্কে জানা যায় —

> "River bank erosion is the deterioration of the banks of a river or stream. It occurs when the top soil that enclosed a river or stream washes away. River bank erosion is a natural occurrence that allows rivers to flow on a proper course. However when accelerated because of un natural causes, the water system is

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 45
Website: https://tirj.org.in, Page No. 416 - 426
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> susceptible to a disproportionate sediment supply, strem channel instability and habitat loss, according to the EPA."[৫]

অর্থাৎ, নদী বা খালের পাড়ের অবনমন যখন ঘটে তখন তাকে নদী-ভাঙন বলা যায়। এটি ঘটে যখন নদীর তীরের উপরের স্তরের মাটি জলস্রোতে ক্ষয় হয়ে যায়। এটি একটি স্বাভাবিক প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া। যা নদীকে নিজ খাতে বয়ে যাওয়ার সহায়তা করে। তবে EPA (Environmental Protection Agency) - এর মতে যখন এই প্রক্রিয়াটি অতি প্রাকৃতিক বা অস্বাভাবিক কারণবশত ত্বরান্বিত হয় তখন জলপ্রবাহিকার সুষমতাহীন অধক্ষেপণ (চর) নদী বা খালের গতিপথের স্থায়ীত্ব অভাব এবং জনজীবনের ক্ষতির প্রবণতা দেখা যায়, তখন তাকে আমরা নদী-ভাঙন বলতে পারি। এ প্রসঙ্গে অবশ্য দিলীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলার নদনদী' গ্রন্থে বিশেষজ্ঞদের মত তুলে নদী-ভাঙন সম্পর্কে বলেছেন —

> "উৎস থেকে শুরু করে মোহনা পর্যন্ত এলাকার ভূতাত্ত্বিক গঠনের ওপর নির্ভর করে নদীর প্রবাহপথ। এই প্রবাহপথের শেষ পর্যায়ে সমতল অঞ্চলে নদীস্রোত বিভিন্ন খাতে বয়ে যায় নানা কারণে। এই পর্যায়ে নদীস্রোতের পরিবর্তন মোহনা অঞ্চলে বদ্বীপ গঠন প্রক্রিয়ায় স্বাভাবিক কারণেই প্রভাব ফেলে। দেখা গেছে, নদীস্রোতের সঙ্গে বয়ে আসা প্রচুর ভাসমান বালি ও পলিকণা বদ্বীপ গঠনের কাজে সক্রিয় ভূমিকা নেয়। ভূবিজ্ঞানীরা বলেন, এই বালি ও পলিকণার জন্ম নদীর অববাহিকা এলাকায় অবিরাম ভূমিক্ষয় থেকে। নদীখাতের ঢাল ও নদীর ব্যাপ্তির ওপর নির্ভর করেই পলিকণা নদীখাত বা নদীতীরে জমতে শুরু করে। তবে নদী খরস্রোতা হলে পলিকণা নদীর খাতে জমতে পারে না, নদীস্রোতে ভেসে চলে যায়। তাই নদীস্রোত মন্থর হলে নদীখাতে চড়া পড়ে বদ্বীপ গঠনের পথে এক ধাপ এগিয়ে যায়। তখন নদীর স্রোতধারা নতুন খাতে প্রবাহিত হয়। এভাবেই প্রাকৃতিক নিয়মে নদীপথ সর্পিল হয়ে ওঠে। নদীর পাড় ভাঙার অন্যতম বা মূল কারণ হল নদীপ্রবাহের এই সর্পিল গতি।"[৬]

পশ্চিমবঙ্গের নদী-ভাঙনের সর্বগ্রাসী প্রভাব লক্ষ করা যায়, গঙ্গা-পদ্মা নদীতে। বর্তমান সময়ে দেখা গেছে, গঙ্গা নদী সবসময়ই প্রবাহিত হয়েছে সর্পিল গতিতে। দু'টি জায়গায় গঙ্গার গভীর নদীখাত অপরিবর্তিত অবস্থায় রয়েছে। সেই দু'টি স্থান- রাজমহল ও ফরাক্কা ব্যারেজ থেকে ১.৬ কি.মি.[৭] ওপরের একটি এলাকায়। এই দু'টি স্থানের কথা বাদ দিলে ১৯২২ সাল থেকে আজ অবধি ফরাক্কা ব্যারেজের উপর নদী অববাহিকার ভাঙন ঘটছে বাম পাড় ঘেঁষে। কিন্তু এই নদী পাড় ভাঙন ফরাক্কা ব্যারেজ নির্মাণের পর থেকে ক্রমশ ওপরের দিকে অর্থাৎ নদীর উজানের দিকে ঘটছে। ব্যারেজ অতিক্রম করার পর গঙ্গা-পদ্মা নদী প্রবাহ ডান পাড় ঘেঁষে বয়ে চলেছে। সুদূর অতীতকাল থেকে আজ পর্যন্ত এই গঙ্গার ব্যারেজের নিচের দিকে ভাঙন ঘটাচ্ছে ডান পাড়ে। ধূলিয়ান এবং নয়নসুখ এলাকার ভাঙন ফরাক্কা ব্যারেজ তৈরি হওয়ার আগে থেকেই লক্ষ করা যায়। এই ভাঙনের ফলে বারহাওয়া ও নিমতিতা স্টেশনের[৮] যোগাযোগকারী রেল লাইনটিকে সরাতে হয়। অন্যদিকে, ১৯৭২-এর পরে ব্যারেজ পার হয়ে গঙ্গা-পদ্মা দু'টি ধারায় প্রবাহিত হত। এর মধ্যে বামদিকের ধারা দিয়ে অনেক বেশি জল প্রবাহিত হত। সেই ধারাটি বালি বা পলিতে মজে যাওয়ার ফলে এখন সমস্ত জল ডান দিক দিয়েই প্রবাহিত হয়। এই নদী-ভাঙনের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি এইরকম-

১. নদী-ভাঙন একটি সময়ে অর্থাৎ ভরা বর্ষাকালে কিংবা তার পরবর্তী সময়ে হয়ে থাকে।

২. নদী-ভাঙন যে এলাকায় হয় সেখানে এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মানুষের স্বাভাবিক জীবন-যাপনের ব্যাঘাত ঘটে।

৩. নদী-ভাঙনে যেমন এক পাড়ের মানুষদের ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে তেমনি অন্য পাড়ে নতুন করে চরের উদ্ভব দেখা দিতে পারে।

৪. নদী-ভাঙনের ফলে মানুষেরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গিয়ে নিজস্ব সংস্কৃতির কথা না ভেবে অন্য সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরে বাঁচার চেষ্টা করে।

৫. নদী-ভাঙন কলবিত মানুষের মধ্যে অর্থনৈতিকভাবে উচ্চবিত্তরা এক নিমেষে নিঃস্ব বা ভিখারিতে পরিণত হতে পারে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 45
Website: https://tirj.org.in, Page No. 416 - 426
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৬. নদী-ভাঙনের ফলে সরকার পরিকল্পিত বিভিন্ন পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হয় না।

৭. নদী-ভাঙনে প্রতিবছর বিভিন্ন বাঁধ, ব্যারেজ, সড়ক ও রেলপথের বহুল ক্ষয়-ক্ষতি হয়ে থাকে।

৮. নদী-ভাঙনের ফলে রাজ্যের কিংবা দেশের সীমানা অনেক সময় পরিবর্তিত হতে দেখা যায়। যেমন - ভারত-বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ড আন্তর্জাতিক-রাজ্য সীমানা।

এই নদী-ভাঙনের বৈশিষ্ট্যগুলি স্বাধীনতা-পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে কীভাবে রূপলাভ করেছে তা এবার দেখে নেওয়া যেতে পারে—

উপন্যাসে নদী-ভাঙন :

চরকাশেম (১৯৪৯)

অমরেন্দ্র ঘোষের 'চরকাশেম' উপন্যাসটি ১৯৪৯ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় তিনি সপরিবারে চলে আসেন কলকতায় পূর্ববঙ্গ থেকে। এখানে এসে সম্পূর্ণভাবে সাহিত্য জীবনে প্রবেশ করেন। উপন্যাসটি ছাব্বিশটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত। ঔপন্যাসিক উপন্যাসটিতে Flash back রীতির অনুসরণ করেছেন। মেছো হাসেমের ছেলে কাশেমের যখন পাঁচ বছর বয়স তখন তার বাবা মারা যায়। সেই সময় বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে কাশেমকে আড়াই টাকার বিনিময়ে বন্ধক থাকতে হয়। সে বড় হয়ে সেই টাকা দিয়ে সেখান থেকে মুক্তি পায় এবং পদ্মার বুকে মাছ ধরা ও জনমজুর খেটে টাকা রোজগার করে। তার স্বপ্ন ছিল যে একদিন পদ্মার বুকে নিরানব্বইকানির চর জাগবে। যার মালিক হবে কাশেম। সত্যি সত্যি পদ্মার বুকে একদিন চর জাগল।[৯] এই চর উপন্যাসে শুধুমাত্র প্রাকৃতিক ঘটনা হয়ে থাকেনি, তা পরিণত হয়েছে অসাম্প্রদায়িক ও উদার মানসিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজের প্রতীক। এই চর কাশেমের নাম অনুসারে পরিচিত হয় চরকাশেম নামে। প্রলয়ঙ্করী পদ্মার খামখেয়ালী রূপে নিরানব্বইকানির চর জলের তলায় তলিয়ে যায়। পরে এই চর জেগে ওঠায় কাশেমের ভেঙে যাওয়া স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছে। ঔপন্যাসিক বর্ষার উন্মত্ত পদ্মার ভাঙন ধারা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন —

ক. "নদী আর নদী। এপার ওপার দেখা যায় না- শুধু মাঝে মাঝে ঝকমক করে উঠছে ঢেউ। ঢেউয়ের পর ঢেউ আছড়ে ভেঙে পড়ছে খাড়ি-পাড়ে এসে। ধ্বসে পড়ছে পাড়। ভাসিয়ে নিচ্ছে গাছপালা। তবু লোকে ভালবাসে নদী-ভালবাসে ঢেউ।"[১০]

খ. "দেখতে দেখতে নদী আরও ভয়াল হয়ে ওঠে বিঘার পর বিঘা পাড় ধ্বসে ধ্বসে পড়তে থাকে জমি ক্ষেত বাগবাগিচা সমেত। বড় বড় নারকেল সুপারি গাছ থৈ পায় না কূলের কাছে।... চির পরিচিতার একি প্রলয়ংকরী মূর্তি? স্নেহ নেই, মায়া নেই, শুধু পুঞ্জ পুঞ্জ ক্ষুধা। লাবণ্য নেই, কেবলই উলংগ নৃশংস বর্বরতা গাঙ গোঙাচ্ছে- ভাঙছে নিষ্করুণভাবে ক্ষুধার্ত নাগিনী গিলে খাচ্ছে সবকিছু। মানুষ পালাচ্ছে বাড়ি ঘর ছেড়ে।"[১১]

উপন্যাসের পটভূমিতে শুধু পূর্ববঙ্গের চাষীদের জীবন চিত্রই পরিলক্ষিত হয়নি, কাহিনিবৃত্তে এসেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, পঞ্চাশের মন্বন্তর, চরকাশেমের মানুষদেরকে অস্থির করে তুলেছে। উপন্যাসের মধ্যে চরকেন্দ্রিক জীবনে দুর্বিসহ যন্ত্রণা নেমে এসেছে আর্থিক দুরাবস্থায় —

"আবার সর্বনাশা হাঁ মেলে আসে দুর্দিন। ওরা খাটতে খাটতে শুকিয়ে যায় তবু অভাবের গহ্বর পূর্ণ করতে পারে না। আয় যা করে তাতে কিছুতেই ব্যয় কুলায় না। চিন্তা-ভাবনায় ওরা হাবুডুবু খায় এক একবার ওরা নির্দিষ্ট দিনে ক্ষেপ থেকে চরকাশেমে ফেরে না। উপোস চলে ঘরে ঘরে। ছেলেমেয়েরা যদিও বা কিছু খায়, পেটেপিঠে ফোঁড়া যায় বয়স্কদের। ... চরের বাসিন্দারা সবাই ভেঙে পড়ে। স্ত্রীলোক বৃদ্ধ যুবা শিশু কেউ বাদ যায় না।"[১২]

এই দুরাবস্থার কারণে এই গোষ্ঠী জীবনের মানুষেরা মহাজনদের কবলে পড়ে একে একে ঘর বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে রাস্তার ভিখারীতে পরিণত হয়েছে। সেই স্বপ্নের চরে শুধু পড়ে থাকে কাশেম, ফুলমন, আঞ্জু এবং রসময়। এরপরেও

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 45
Website: https://tirj.org.in, Page No. 416 - 426
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কাশেমের জীবনে অভাব অনটন এলেও সে এই চর ছেড়ে যায় না। অবশেষে জীবন হালদারের প্রচেষ্টায় ফিরে পায় বেঁচে ওঠার রসদ। গড়ে তোলে জমিদার, জোতদার ও ব্যাপারিদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার মনোবল। এখানে নদী-ভাঙনের কবলে চর জীবনকেন্দ্রিক সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের পাশাপাশি সমাজের উচ্চবিত্তের বিরুদ্ধে নিম্নবিত্ত মৎসজীবীদের প্রতিবাদের চিত্রও পরিলক্ষিত হয়েছে। উপন্যাসটি সামাজিক পালাবদল সম্পর্কে প্রতাপরঞ্জন হাজরা বলেছেন —

> "পূর্ব বাংলার বরিশাল ও ফরিদপুর অঞ্চলের চরের কাহিনি হলেও তা শেষ পর্যন্ত আঞ্চলিকতার গণ্ডি অতিক্রম করে বেরিয়ে এসে সমস্ত সংগ্রামী মানুষের প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে। কেন-না কাশেমের স্বপ্ন আর তার ব্যক্তিগত স্বপ্ন হয়ে থাকেনি। ব্যক্তির গণ্ডি অতিক্রম করে সমস্ত মানুষের আশার, শান্তিকামী মানুষের কামনার স্বপ্নে রূপান্তরিত হয়েছে।"[১৩]

মহানন্দা (১৯৫১)

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মহানন্দা' উপন্যাসটি দু'টি ভাগে (প্রথম-১৫টি, দ্বিতীয়-১০টি অধ্যায়ে) বিন্যস্ত। লেখক জন্মসূত্রে পূর্ববঙ্গের মানুষ হলেও অধ্যাপনাসূত্রে উত্তরবঙ্গের জন-জীবন ও নদী মহানন্দার সঙ্গে পরিচিত হন। উপন্যাসটিতে তিনি কাল ও সময়ের নিগূঢ় পট-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবী মন্ত্রে[১৪] দীক্ষিত যুবকের মধ্য দিয়ে মহানন্দার খামখেয়ালিপনা ও তার সঙ্গে জীবন সত্যের নান্দনিক, রোমান্টিক ও বস্তুনিষ্ঠ দিকের তনিষ্ঠ পরিচয় দিয়েছেন। উপন্যাসের নদী মহানন্দার ব্যাপক ভূমিকা না থাকলেও নায়ক নীতীশের জীবনে এর গুরুত্ব কম ছিল না। কাহিনির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাজনীতি, বৈষ্ণব সংস্কৃতি এবং সমগ্র ভারতবর্ষের চিত্র ঔপন্যাসিকের জীবন বোধের স্পর্শে নবরূপ লাভ করেছে।[১৫] উপন্যাসের কেন্দ্র ভূমিতে নদী মহানন্দার অতীত ও বর্তমানের সঙ্গে নায়ক নীতীশের জীবন ও কর্মধারার যোগসূত্র রচিত হয়েছে। উপন্যাসের শুরুতে মহানন্দার পরিচয় দিতে গিয়ে লেখক বলেছেন —

> "মরে যাচ্ছে মহানন্দা, শুকিয়ে আসছে দিনের পর দিন। উত্তর বাংলার শ্যামল মাটির শ্রেষ্ঠ প্রাণপ্রবাহিনীর সর্বাঙ্গে নেমেছে অপঘাতের ছায়া। এদিকে ওদিকে যে দু'চারটে স্টিমার সার্ভিস ছিল, আস্তে আস্তে তা বন্ধ হয়ে আসছে, নদীতে জল নেই। বর্ষায় আর শরতের কয়েকটা মাস ছাড়া মরা নদী মহানন্দার দিকে তাকালে কষ্ট হয়। বিশাল বালু শয্যার মাঝখানে এদিকে ওদিকে তির তির করে দু'একটা জলের রেখা বয়ে যায়, কোনোটায় স্রোত চলে, কোনোটায় চলে না।"[১৬]

কিন্তু বর্ষার মহানন্দার খামখেয়ালিপনার চিত্রটা একটু আলাদা —

> "বর্ষায় - তির তিরে নীলজলে নামে ঘোলা জলের পাহাড়ি বান। শ্যাওলার স্তর ভাসিয়ে নিয়ে যায়, হারিয়ে যায় বনঝাউয়ের দল, মোটা মোটা গম্বুজগুলোকে কেন্দ্র করে জেগে ওঠে নদীর ভৈরব গর্জন চলতি ট্রেনের যাত্রীরা ভয়ার্ত চোখে তাকায় নীচের জলের উন্মত্ত আক্রোশের দিকে-যদি ব্রীজটাকে ভাঙে হঠাৎ?"[১৭]

বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত নায়ক নীতীশ যৌবনের শুরুতে নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও যোদপুর গ্রামে নিজের অতিপ্রিয় নদী মহানন্দা ও স্ত্রী মাল্লিকাকে ছেড়ে চলে যেতে হয়, খুন ও ডাকাতির অপরাধে জেলে বারো বছরের জন্য। সেখান থেকে ফিরে এসে সে দেখেছে শুধু নদীর চিত্রের পট-পরিবর্তন হয় নি, পরিবর্তন হয়েছে সমাজ, রাজনীতি এবং অর্থনীতির। কালের অমোঘ পরিবর্তনের প্রভাব মল্লিকার জীবন বোধের ধারাকে অন্য খাতে প্রবাহিত করেছে —

> "শান্ত মহানন্দা গর্জে উঠল- ঘোলা জলের অর্ঘ্য ঢেলে দিতে লাগল কালিন্দী, ফুল্লরা, পুনর্ভবা, নিমাসরাই স্তম্ভের নীচে নদী কুপিতা ধূমাবতীর মূর্তি। চরের বনঝাউগুলোর চিহ্ন রইল না।"[১৮]

নদী-ভাঙনের মতো মল্লিকার সংসারেও ভাঙন দেখা দিল। দীর্ঘ বারো বছর পর নীতীশ যোধপুর গ্রামে ফিরে এসে মহানন্দার অন্য রূপ পরিদর্শন করেছে। এক সময় হিমালয়ের বরফ গলা জলে পুষ্ট কুশী নদীর জলে মহানন্দার বুকে দেখা দিত ভাঙন। পরবর্তীতে এই নদী দিক পরিবর্তন করায় মহানন্দার সেই ভয়ঙ্করী রূপ আর নেই —

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 45
Website: https://tirj.org.in, Page No. 416 - 426
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "বর্ষার জল থিতিয়ে আসছে এর মধ্যেই, জলের তলা থেকে ভুতুড়ে মাথাগুলো আকাশে তুলে ধরতে চাচ্ছে ডুবন্ত ঝোপঝাড়ের দল। এত স্বল্প স্থায়ী এখন মহানন্দার বাণ এত অল্পদিনেই এমন করে তার জল নেমে যায়। আর এক মাসের মধ্যেই তা হলে আবার জরাগ্রস্ত হয়ে পড়বে বালির চড়ার ওপর পঙ্কিল পলিমাটির আস্তরণ রেখে চলে যাবে বন্যার জল, ক্ষণ যৌবনের অস্থায়ী উন্মত্ততার গ্লানির স্বাক্ষর মহানন্দার বুকে ছড়িয়ে থাকবে কিছুদিন।"[১৯]

নীতিশ এই মজে যাওয়া মহানন্দার সঙ্গে নিজের জীবনের মিল খুঁজে পায় কোথাও। সে কলকাতায় চলে গেলেও দুর্বার আকর্ষণে ফিরে আসে যোধপুরে। সে বিশ্বাস করে এই চর পড়া মহানন্দার গর্ভে একদিন না একদিন নব যৌবনের জোয়ার আসবে। এ উপন্যাসেও নদী-ভাঙনের ফলে নদী ক্রমশ মজে যাওয়ার ভিন্ন চিত্র লক্ষ করা গেছে।

গড় শ্রীখণ্ড (১৯৫৭)

পদ্মা নদী ও নদী তীরবর্তী মানুষের জীবন গাঁথা রচনা করেছেন অমিয়ভূষণ মজুমদার তাঁর 'গড় শ্রীখণ্ড' উপন্যাসে। এই উপন্যাসটি ১৩৬০ বঙ্গাব্দে 'পূর্বাশা' পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটির ৩৮টি পরিচ্ছেদে ঔপন্যাসিক তিন ধরণের মানুষের কথকতা গ্রাম ও শহরের রৈখিক পারম্পর্যের মাধ্যমে উপস্থাপিত করেছেন—

প্রথমত : সান্দার গোষ্ঠী;
দ্বিতীয়ত : মাঝি ও কৃষক গোষ্ঠী;
তৃতীয়ত : সান্যাল মশাইয়ের জমিদারী পরিবার।

প্রথম গোষ্ঠীর নির্দিষ্ট কোনো জীবন-ধারণের রীতি না থাকায় এরা নদী তীরবর্তীতে চালের চোরাচালান এবং বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকে। দ্বিতীয় গোষ্ঠী চাষাবাদ করে জীবন অতিবাহিত করে। এর মধ্যে রয়েছে রামচন্দ্র মুণ্ডলা, এরফান, চৈতন্য সাহা, ছিদাম প্রমুখরা। এদের জীবন বিভিন্ন সময়ে নদীর অতল গহনে তলিয়ে যায়। এরা অপেক্ষা করে নতুন জীবন গড়তে। তাই নদী চর জাগালে এদের মুখে হাসি ফোটে। লেখক এই তিন শ্রেণির মানুষের জীবন-ধারণ, পেশাগত অবস্থান এবং আর্থিক ভিত্তিকে ভিন্ন আঙ্গিকে চিত্রিত করলেও পদ্মার খামখেয়ালিপনা, দেশভাগ, দুর্ভিক্ষ, পুনর্বাসন সমস্যা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাজনিত সমস্যা এদেরকে একই সূত্রে গ্রথিত করেছে। উপন্যাসটিতে নদী-ভাঙনের যে বিশেষত্বগুলি লক্ষ করা যায় তা ঠিক এইরকম —

ক. নদীশাসন ও নদী পরম্পরা;
খ. চর সৃষ্টি, চর বিলীন হওয়া এবং চর দখলের রাজনীতি;
গ. নদীগত উদ্বাস্তু (River Migration) সমস্যা।

উপন্যাসে পদ্মা নদী মূল চরিত্র হয়ে দেখা দিয়েছে। পদ্মার ভয়াল হিংস্রতা যেমন গ্রামের পর গ্রামকে গ্রাস করে তেমনি ভয়ংকর ধ্বংসের মধ্যে গড়ে তোলে নরম পলিমাটির চর। যে মানুষগুলির জীবন পদ্মার করাল গ্রাসে শেষ হয়ে গিয়েছিল, তারা কিংবা অন্য কোনো গোষ্ঠী নতুন করে জীবনের ভিত্তি রচনা করে সেই চরে। তাই পদ্মার জীবনে যেমন এগিয়ে যাওয়ার দ্বান্দ্বিকতার ইতিহাস আছে তেমনি রয়েছে মানব জীবনের জটিল দ্বন্দ্বময় প্রতিভাস। এই পদ্মার গ্রাসে সুরোতুন ও মাধাই-এর প্রেমের বিচ্ছিন্নতা ঘটেছে। কারণ তাদের পরস্পরের কাছে আসার মধ্যে যে সংকোচ ছিল তা তারা কাটিয়ে উঠতে পারেনি।[২০] অনেকদিনের সামাজিক সংস্কারকে ভেঙে নতুনের দিকে ধাবিত হতে না পারার কারণেই তাদের এই প্রেমের বিচ্ছেদ ঘটেছে। উপন্যাসের সূচনায় ব্রিজ বাঁধা পদ্মার সঙ্গে ঔপন্যাসিক সুরোতুনের বা সুমিতরি বদ্ধ অবস্থার অভিন্ন তাৎপর্যকে মিলিয়ে দিয়েছেন—

> "বাঙাল নদী পদ্মা এখানে বন্ধনে পড়েছে, 'বিরিজ' বলে লোকভাষায়।... ব্রিজটা অত্যন্ত উঁচু, তার ধরাছোঁয়া পাওয়ার জন্য গ্রামের জমি থেকে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মও উঁচু। এত উঁচু যে বড়ো-বড়ো তালগাছগুলিও পায়ের নিচে থাকে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ালে।"[২১]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 45
Website: https://tirj.org.in, Page No. 416 - 426
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তেমনি শেষে পদ্মা যেমন বাঁধ ভেঙে সবকিছুকে প্লাবিত করে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে তেমনি সুরোতুন তার যাবতীয় সংকোচ, সংস্কার, দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করে সংসার ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে। এর পাশাপাশি লেখকের আশা যে নবীন পলি মাটির চর পদ্মার বুকে জেগেছে তাতে যারা জন্ম নেবে তারা সমাজের কুসংস্কার, শ্রেণিচেতনার দ্বন্দ্ব, ধর্মীয় গোড়ামির সমস্ত দেওয়াল ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে নবতর সমাজ ব্যবস্থার নতুন সেতু নির্মাণ করবে।

ইলিশমারির চর (১৯৬২)

সুন্দরবন অঞ্চলে চরজীবনকেন্দ্রিক উপন্যাসগুলির মধ্যে আব্দুল জব্বারের 'ইলিশমারির চর' এক অনন্য সংযোজন। উপন্যাসটি ১৯৬২ সালে আব্দুল আজিজ আল আলম সম্পাদিত 'জাগরণ' পত্রিকায়[২২] প্রকাশিত হয়। আব্দুল জব্বারের 'ইলিশমারির চর' উপন্যাসের ১৯টি পরিচ্ছেদে গঙ্গা-ভাঙনের বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। এই ইলিশমারির চরের বাসিন্দা হন জেলেরা। গঙ্গা তাদের একমাত্র ভরসা। বর্ষার মরশুমে গঙ্গাতেই তারা মাছ ধরে জীবনজীবিকা নির্বাহ করে। প্রচণ্ড বৃষ্টিতে প্রাণের ঝুঁকি নিয়েও তারা বিধ্বংসী গঙ্গায় নামে মাছ ধরতে। তারা প্রতিকূলতার মধ্যে নিজেদের বাঁচার লড়াই চালিয়ে যায়। এই বেঁচে থাকার লড়াইয়ে জয়নদ্দি, হরেন, কানাই শরিক হয়েছে।

গঙ্গার নিম্নগতি এবং সুন্দরবন ব-দ্বীপ অঞ্চলে গড়ে ওঠা একটি চর-ই ইলিশমারির চর। এই চরে বসবাস করে মাছমরা জেলে, মাঝি, মহাজনসহ হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ। জব্বার নিজে ২৪-পরগণায় জন্মগ্রহণ করার কারণে নিজস্ব ব্যক্তি অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এই সকল চর অঞ্চলের অধিবাসীদের কথকতা তুলে ধরেছেন। মানিক, অদ্বৈত কিংবা সমরেশের থেকে তিনি যে স্বতন্ত্র তার আভাস রয়েছে এই উপন্যাসে। এই উপন্যাসে কয়েকটি বিশেষত্ব নিম্নরূপ:

ক. চর জীবনকেন্দ্রিক জীবনচর্চা;
খ. মহাজনদের ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি ও রাজনীতি;
গ. জেলেদের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক পরিবেশ ও পরিস্থিতি।

হুগলি নদীর বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে জেলেদের অবাধ বিচরণ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে ইলিশের মরশুম ফুরালে যেমন জেলেরা অর্থহীন হয়ে পড়ে, অভাব-অনটনে দিন কাটায় তেমনি এই উপন্যাসের জেলেরা ইলিশের মরশুম ফুরালে গহন সমুদ্রে পাড়ি দেয়। ইলিশের মরশুমে মহাজন তারিণী মাঝি ও তরব-দি মাঝির মতো মহাজনদের কাছে ভগের নৌকায় কাজ করে। যা মাছ পায় আড়াইটা ভাগ মহাজনদের দিতে হয়। ইলিশের মরশুমে এই জেলে পাড়ার বুড়ো এবং বউয়েরা বাদে সবাই গাঙে চলে যায়। পাড়ার বুড়ো ও বউরা তাদের ঘরে ফেরার অপেক্ষায় বসে থাকে। অন্যদিকে, বর্ষায় নদীও এই চরকে আস্তে আস্তে গ্রাস করতে থাকে—

ক. "ওদিকের বিরাট একটা অংশ জুড়ে বুক-শিউরে-ওঠা ধস নামছে প্রতি বছরে বছরে, ইলিশমারির চরের বুকে এগিয়ে চলেছে ধান-জমিকে গ্রাস করতে করতে।"[২৩]
খ. "পোর্ট কমিসনের হাজার শক্ত বাঁধুনীকেও সে ভ্রূক্ষেপ করে না। এই ভাঙা চরের মাঝখানে আছে পাঁচটি খেজুরগাছ-ঘেরা সবুজ ঘাসওয়ালা একখণ্ড জমি।"[২৪]

বর্ষাকালে জেলেদের এই ভাঙনের দিকে নজর দেওয়ার সময় নেই। কারণ জেলেরা মহাজনের কৃপাধন্য। অর্থনৈতিকভাবে নিম্নবিত্ত জেলেরা তাদের টাকা শোধ দিতে না পারলে সেই টাকার শোধ নেয় ঘরের যুবতী মেয়ে ও বউয়ের শরীরের বিনিময়ে। এইভাবে কানাইয়ের যুবতী মেয়ে মালতীকে তরব-দি মহাজন শারীরিক অত্যাচার করে।[২৫] আবার হরেনের বউ সিন্ধু তরব-দিকে নিজের শরীর সঁপে দিতে চায় না। তাই অন্তঃসত্ত্বা সিন্ধুকে খুন হতে হয়। আর্থিক অবস্থা খারাপ হলে চর অঞ্চলের মানুষদেরকে কতটা নির্মম অত্যাচার সহ্য করতে হয় তার-ই বয়ান যেন তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক। বড় জেলেদের পাশাপাশি খুচরো মেছোনিদের কথাও এখানে উঠে এসেছে। মহাজনের নৌকায় জয়নদ্দি, হরেন ও কানাই কাজ করে। মহাজনের কাছ থেকে মাছ যা ভাগ পায় জয়নদ্দি তিনটি সমান ভাগ করে। আবার, কখনো পাওনা থেকে হরেন, কানাই বঞ্চিত হলে মহাজনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও করেছে। মানিকের পদ্মায় যেমন বেশি মাছ উঠলে জেলেদের মনে আতঙ্কের ছাপ লক্ষ করা যায় তেমনি এখানে জেলেরা চায় বেশি মাছ। কারণ, এখানে তারা মাছ বেশি পেলে তাদের হাতে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 45
Website: https://tirj.org.in, Page No. 416 - 426
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

একটু বেশি টাকা রোজগার হয়। জেলে জীবনকেন্দ্রিক উপন্যাসগুলিতে যেমন প্রকৃতির খামখেয়ালিপনা, মহাজনদের শোষণ-অত্যাচার থেকে জেলেরা বেরিয়ে আসতে পারেনি। কিন্তু এই উপন্যাসের শেষে দেখা গেছে, জয়নদ্দি নিজে জমি ও নৌকার মালিক হয়েছে। তার দুটো নৌকায় পাঁচজন জেলে কাজ করে। অর্থনৈতিকভাবে এই নিম্নবিত্ত মানুষেরা নিজেদের প্রচেষ্টায় সমাজে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। মহাজনদের শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে, মহাজনদের বাধ্য করেছে তাদের দাবি মানতে। অন্যদিকে, রতনের প্রচেষ্টায় একটি স্কুলও স্থাপিত হয়েছে। তার ফলে চরের মানুষেরা পেয়েছে শিক্ষার আলো।[২৬] ঔপন্যাসিক রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ পরিস্থিতির বাস্তব রূপায়ণে ধীবর সমাজের এক নব দিগন্তের উন্মোচন ঘটিয়েছেন এই উপন্যাসে।

গহিন গাঙ (১৯৮০)

সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'গহিন গাঙ' উপন্যাসটি ১৯৭৯ সালে 'প্রান্তিক' শারদীয়া সংখ্যায় এবং ১৯৮০ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসের ৬টি পরিচ্ছেদে বেতনা নদীর ধারে মালোপাড়ার মাছমারাদের জীবন-যাপনের সুখ-দুঃখের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। এই বেতনা নদী বর্ষা এলেই ফুলে ফেঁপে ওঠে। রায়মঙ্গলের থেকে নিজেকে আলাদা করতে এর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও বিদ্যামান। তাই এই নদী মালোদের জন্য নিয়ে আসে চিংড়ি, ভেটকি থেকে শুরু করে নোনা জলের হাজারো মাছ। মালোদের ইতিহাস অর্থনৈতিক সংকটের ইতিহাস। সুদখোর মহাজনদের কাছ থেকে দাদন নেওয়ার ফলে নিম্নবিত্ত মালোরা সোনার গাঙের সোনার ফসল ঘরে তুলতে পারে না। সবটুকুই দিয়ে আসতে হয় সুদখোর মহাজনদের। এই মালোপাড়ার অপর একটি নাম আছে - 'বিধবা পল্লী'। উপন্যাসটির কাহিনি বিধবা পল্লী থেকে শুরু করে বেতনা, সোনার গাঁ, হিঙ্গলগঞ্জ, কচুখালি, বিদ্যার জঙ্গল, বাসন্তী, রাঙাবেলিয়া, ক্যানিংসহ অন্যান্য অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ। মালোদের কাছে নৌকা ও জাল দুটোই জীবনের চলমানতার প্রতীক। সোনার গাঙে মালোরা দুটো প্রজাতিতে বিভক্ত। একটি 'মালো' অন্যটি 'নিকিরি'। মালোরা জাল ও নৌকা নিয়ে গাহিন গাঙে মাছ ধরতে যায় বলে নিজেদেরকে নিকিদের থেকে উন্নত বলে মনে করে। আর নিকিরা কাদা বা পাঁক থেকে মাছ খুঁজে নিজেদের জীবন নির্বাহ করে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় সপরিবারে উপস্থিত হয় বিডিও অফিসে, রিলিফের জন্য। মালোপাড়ার প্রধান দ্বন্দ্বটা মালোদের সঙ্গে মালোদের নয়, মালোদের সঙ্গে জোতদারদের। একদিকে ননীবালা, ললিত, দয়াল খুড়ো, হারান, মধ্য এবং ললিতের ছেলে শ্রীপদ ও লগা। অন্যদিকে, আব্দুল, ইশ্বর মণ্ডল ও পাঁচু ভট্টাচার্যের মতো মানুষদের সঙ্গে মূল সংগ্রাম। মালোরা যখন ক্যানিং-এর মহাজনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল তখন তার নেতৃত্ব দিয়েছিল ললিত বর্মণ। কারণ ভূপতি ডাক্তার কো-অপারেটিভ ফিসিং-এর একটি ব্যবস্থাপনায় এই মালোদের উপকার করতে চেয়েছিল। কিন্তু লঞ্চের মালিক ও ঘাটিদাররা মিলে এই ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে পরিকল্পনাটি সফল হতে দেয়নি। তাই মালো সমাজ অন্ধকারে পড়ে থাকে। এই ষড়যন্ত্রে মালোরা আত্মসমর্পণ করে অর্থনৈতিকভাবে উচ্চবিত্ত জোতদারদের কাছে। তারা আত্মসমর্পণ করলেও 'পদ্মানদীর মাঝি', 'তিতাস একটি নদীর নাম', এবং 'গঙ্গা' উপন্যাসে মালোদের মতো তাদের অবস্থা হয়নি। অর্থাৎ এখানে মালোদেরও সমাজে উত্তরণ লক্ষ করা গেছে। ছোট গাঙে মাছ পাওয়া না গেলে তাদের আর্থিক সংকট আরো অধিক হয়ে ওঠে। ললিতকে বাঘে নিয়ে যাওয়ার পর তার ছেলে শ্রীপদ মালো সম্প্রদায়ের নিয়ম অনুযায়ী কুশপুতুল না পুড়িয়ে বাবার তিন বছর আগে ধার নেওয়া পঞ্চাশ টাকা সুদে আসলে দু'শো পঁয়তাল্লিশ টাকা শোধ করে এবং নিজের ছেলে যাতে ঋণগ্রস্ত না হয় সেদিকেও লক্ষ রাখে। এখানে নদী শুধু গহিন হয় না, নদীমাতৃক জীবনের হাঁ মুখটিই গহীন হয়।[২৭] সময় সময়ে নদী ভয়াল, ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। উপন্যাসের শেষে বেতনা নদীর ভয়ংকর ঘূর্ণিতে মেতেছে—

> "বাপ! বাপরে! আসিস নি সর্বনাশীর কাছে। জলস্তম্ভ ভেঙে ভেঙে পড়ে, ঢেউ কমে আসে, পদর চোখের সামনে বেতনা জল ঠেলে নিয়ে যায় সাগরে।"[২৮]

শ্রীপদকে জীবন দ্বন্দ্বের মাঝে দাঁড়িয়ে পরাজয়ের বশ্যতা স্বীকার করে নিতে হয়। তাই সে স্থান, কাল, বাস্তবতার নিরিখে জীবনের টানে এবং বাঁচার তাগিদে ঘৃণা, ক্রোধ ও প্রতিবাদের আগুনকে বুকের মধ্যে চেপে রেখে চলমানতাকেই বেছে নিয়েছে। আর নৌকা, জাল ও সোনার গাঙ হয়ে উঠেছে এই চলমানতার প্রতীক।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 45
Website: https://tirj.org.in, Page No. 416 - 426
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

জল মাটি আগুনের উপাখ্যান (১৯৯৬)

আশির দশকে ভৈরব নদীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত নিয়ে যিনি উপন্যাস রচনা করলেন, তিনি অবশ্যই আবুল বাশার। বাশার দীর্ঘদিন এই অঞ্চলে বসবাস করার ফলে, সেখানকার মানুষদের জীবন-যাপন ও জীবিকা নির্ভরের দিকটিকে উপন্যাসের বিষয়বস্তু করে তুলেছেন। শুধু তাই নয়, এই উপন্যাসে লোকায়ত জীবন, ইসলামীয় মিথ, হিন্দু পুরাণ এবং ওল্ড টেস্টামেন্টের সংমিশ্রণ[২৯] ঘটিয়েছেন নিপুণ ভাবে। 'জল মাটি আগুনের উপাখ্যান' উপন্যাসটি ৮টি পরিচ্ছেদে এবং মুর্শিদাবাদ জেলার ভৈরব নদী ভাঙনের প্রেক্ষাপটে রচিত। ভাঙনের ফলে, ভৈরব নদী পাড়ের মাটিকে কেন্দ্র করে চাষি ও কুমোর সম্প্রদায়ের সঙ্গে দ্বন্দ্বের অবকাশ লক্ষ করা গেছে —

> "ওরা জানে না। নাম মদন ভাবে। ওরা যেন কিছুই জানে না। নদীকে যেন কখনও প্ররোচিত করে না পাড় ভাঙতে! এই গুহায় জল কি ঢোকে না বর্ষাপ্লাবনে! গুহা করে বলে তো চুঁটঅলা জমি ভেঙে পড়ে জলের ধাক্কায়, জলের ফিসফিসামি শোননি? ষড়যন্ত্র জান না?"[৩০]

এখানে ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন নদী পাড় থেকে মাটি কাটলে আইনসম্মত ভাবে কারোর কিছুই কররা থাকে না। কোনো চাষির জমি থেকে মাটি কাটলে সেটা অপারাধ হয়। তাই নদীর ধারে যে চাষির জমি, সে শুধু মহাক্রোধে কুমোরকে গালিগালাজ দিয়ে শান্ত হয়। এখানে নদী-ভাঙন একশ্রেণির (চাষি) মানুষের কাছে দুঃখের কারণ হলেও অন্য শ্রেণি অর্থাৎ কুমোরের কাছে সেটা আনন্দের বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে। নদী-ভাঙনে চাষিরা জমি হারিয়ে আর্থিকভাবে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। অন্যদিকে, স্বাভাবিক নিয়মেই নদী ঐ মাটিকে নিয়ে অন্য পাড়ে চরে পরিণত করেছে। তাতে মাটি পাওয়ার সুবিধা হয়েছে কুমোরদের।

সেই মাটিকে কাজে লাগিয়ে মৃৎ পাত্র নির্মাণ করে তারা আর্থিক বুনিয়াদ মজবুত করেছে। নদীর যেই পাড় বরাবর মানুষের বসতি থাকে সেই পাড়ে নদী শাসনের চিত্রটাও বেশি লক্ষ করা যায়। তাই সেই পাড় দুর্যোগপূর্ণ দিনে বেশি পরিমাণে ক্ষয় করে—

> ক. "ওপারে ভাঙন নেই। নদী পলি ফেলে চরের সঙ্গে সমতল রেখায় সমান হতে চাইছে; পাড়ের ভাঙন শুধু এপারে। এপারে বসতি, এপারেই ভাঙন।"[৩১]
>
> খ. "বর্ষার ভাঙতে ভাঙতে থেকে পড়া সুবৃহৎ কাঁধালে ফাট ধরে নদীর পথের সীমানা ছাড়িয়ে কখন অজ্ঞাত নাম মদনের জমির একটি বড় অংশ অবধি সেই ভাঙন-ফাট প্রসারিত হয়েছে। রবিশষ্যের ঝুনো ফসল ঝাড়ে সেই ফাট ছিল ঢাকা, চেন এই ফাটের উপর দিয়ে টেনে বেড়াল মদন, একটু আগে।"[৩২]
>
> গ. "তখন সেই চাঙড় গিয়ে নদীর জলে মোষের মতন ভোঁস করে ঝাঁপ দিল। মনে হল, মাটিও প্রাণী। সবই অবাক ব্যথায় দাঁড়িয়ে লক্ষ করল নাম মদন। মাটিতে সে একফোঁটা হাতও লাগাল না। স্পর্শ করতে ইচ্ছে হল না তার। এই রকম রোদের তাতে পোড়া, শুকনো মাটি আশ্চর্য করে ধসে গেল। চৈত্রে এমন ভাঙন বিশ্বাস করতে চায় না মন।"[৩৩]

শুধু যে নদী বর্ষাকালে পাড় ভাঙন ঘটায় এমনটি নয়, বর্ষার পরবর্তী সময়ে জলস্তর নিচে নেমে গেলে সেই ভাঙন অব্যাহত থাকে—

> "বর্ষা-বন্যার জল নামতে শুরু করলে ভাঙন লাগে কাঁধালে। অবশ্য জলভরা নদীতেও পাড় ভাঙার কাজ চলে। তবে জল নামার সময়ই দাপানি বেড়ে যায়। বর্ষা শেষ হয়েছিল। পাড় ভাঙছে। মৃন্ময়ী পাড় ভাঙা দেখছিল। মিতের জমির উপর নদীর চোট এবার সবচেয়ে বেশি। কী একটা অদ্ভুত আক্রোশ। কখনও কখনও নদী বিশেষ একটা জমিকে ধ্বংস করার জন্য আক্রমণ কেন্দ্রীভূত করে।"[৩৪]

উপন্যাসে ঔপন্যাসিক জল-মাটি-আগুনের সঙ্গে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের বন্ধনকে চিত্রিত করেছেন। তার সঙ্গে এই নদী পার্শ্ববর্তী মানুষদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, মৃন্ময়ীকে ঘিরে চাষি মদন ও কুম্ভকার মদনের প্রেম ও দ্বন্দ্বময় চিত্র এবং ভৈরবের প্রতিহিংসার আগুন এই জনজীবনকে বিনষ্ট করে দিয়েছে। তাই ঔপন্যাসিক উপন্যাসের শেষে বলেছেন —

> "মিলনে সম্পূর্ণতা নয়, অভিশাপের সঙ্গে পাপের সম্পূর্ণতাই জল মাটি আগুনের উপ্যাখ্যান।"[৩৫]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 45
Website: https://tirj.org.in, Page No. 416 - 426
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নদী-ভাঙন ভূগোলের বিষয় হলেও সেই বিষয়টিকে নিয়ে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা ঔপন্যাসিকরা তাঁদের উপন্যাসে যথাযথ ভাবে প্রয়োগ করেছেন। নদী-ভাঙন তত্ত্ব এবং সেই তত্ত্বের আধারে জনজীবনের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পট পরিবর্তনের যে চিত্র আমরা লক্ষ করি তা এক বিশেষ সময়ের কালপর্বে মানব জীবনের বিশ্বস্ত দলিল হয়ে উঠেছে।

Reference:

১. https://bn.m.wikipedia.org, Date-02.12.2024
২. *The American Haritage Dictionary*, Second Edition, Houghton Mifflin Harcourt Publishing, USA, 2014 [দ্র: www.the free dictionary.com. Date-02.12.2024]
৩. Burden, Ernest, *Illustrated Dictionary of Architecture*, Third Edition, McGraw Hill, New York, 2012 [দ্র: www.thefreedictionary.com, Date-02.12.2024]
৪. আসাদুজ্জামান, ইসলাম, জহুরুল, আখতার লুবানা, রহমান, ওহিদুর, রহমান, হাবিবুর, *সমাজবিজ্ঞান পরিচিতি*, প্রথম প্রকাশ, কবির পাবলিকেশনস্, ঢাকা, ২০১১-২০১২, পৃ. ৩২৪
৫. www.referance.com, Date-02.12.2024
৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপকুমার, *বাংলার নদনদী*, দ্বিতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ১৯১
৭. তদেব, পৃ. ১৯৩
৮. তদেব, পৃ. ১৯৩
৯. হাজরা, প্রতাপরঞ্জন, *অমরেন্দ্র ঘোষ জীবন ও সাহিত্য সাধনা*, তৃতীয় সংস্করণ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ১০৪
১০. ঘোষ, অমরেন্দ্র, *চরকাশেম*, পুনর্মুদ্রণ, সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ৩৫
১১. তদেব, পৃ. ৫৫
১২. তদেব, পৃ. ১২১
১৩. হাজরা, প্রতাপরঞ্জন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৫
১৪. রায়, অলোক, *বাংলা উপন্যাস প্রত্যাশা প্রাপ্তি*, প্রথম প্রকাশ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ১৪৩
১৫. মজুমদার, ড. সমরেশ, *গল্প-উপন্যাসের অন্তর্জীবন*, প্রথম প্রকাশ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৩৮২
১৬. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড) (মহানন্দা)*, পঞ্চম সংস্করণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৪২০, পৃ. ১৩৫
১৭. তদেব, পৃ. ১৩৫
১৮. তদেব, পৃ. ১৩৮
১৯. তদেব, পৃ. ১৪৭
২০. সামন্ত, ড. প্রভাস চন্দ্র, *নদীকেন্দ্রিক বাংলা উপন্যাস*, প্রথম প্রকাশ, প্রভা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ৬৩
২১. মজুমদার, অমিয়ভূষণ, *গড় শ্রীখণ্ড*, *দ্বিতীয়* সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৯
২২. দাশ, শচীন, *ইলিশমারির চর: সুন্দরবনের জেলে জীবনের এক নতুন আখ্যান*, [*সমকালের জিয়নকাঠি, সুন্দরবন কথাসাহিত্য বিশেষ সংখ্যা*, প্রথম খণ্ড, সম্পাদক - নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল], ২০১১, পৃ. ৮৩
২৩. জব্বার, আব্দুল, *ইলিশমারির চর*, *দ্বিতীয়* সংস্করণ, লেখা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ৫
২৪. তদেব, পৃ. ৫
২৫. মাল, ড. সুদেব, *জেলে-জীবন ও বাংলা কথাসাহিত্য*, প্রথম প্রকাশ, ঘোষ অ্যান্ড কোং, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ৮৭

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 45
Website: https://tirj.org.in, Page No. 416 - 426
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

২৬. সরকার, ড. তারক, *ইলিশমারির চর: জীবনের নবদিগন্ত*, [*বনানী (আব্দুল জব্বার সংখ্যা)*, সম্পাদক - অধীরকৃষ্ণ মণ্ডল], ২০০৯, পৃ. ১১৪
২৭. মণ্ডল, অলোক, *সুন্দরবনের নিসর্গ, সমাজ ও মানুষের এক জীবন চিত্রশালা–গহীন গাঙ*, [*সমকালের জিয়নকাঠি, সুন্দরবন, কথাসাহিত্য বিশেষ সংখ্যা*, (সম্পাদক- নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল)], ২০১১, পৃ. ১৮৫
২৮. চট্টোপাধ্যায়, সাধন, *গহিন গাঙ*, প্রকাশ, ভাবনা, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ৬১
২৯. দত্ত, সমীরণ, *আবুল বাশারের উপন্যাসে মুসলিম জীবনের অন্তঃস্বর*, প্রথম প্রকাশ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ৫৫
৩০. বাশার, আবুল, *জল মাটি আগুনের উপাখ্যান*, প্রথম সংস্করণ, আনন্দ, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ২১
৩১. তদেব, পৃ. ২৩
৩২. তদেব, পৃ. ৩৬-৩৭
৩৩. তদেব, পৃ. ৩৭
৩৪. তদেব, পৃ. ১০১
৩৫. তদেব, পৃ. ১৬৯